লোক প্রশাসন সাময়িকী
একাদশ সংখ্যা, মার্চ ৯৮, চৈত্র ১৪০৪

মহিলা ও শিশুদের অবস্থা পর্যালোচনা ঃ বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত

আ, ক, ম, মাহবুবুজ্জামান *

ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৮.৫২ ভাগ মহিলা। অপরদিকে অনূর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা শতকরা ৪৫ ভাগ। এই ৪৫ ভাগের মধ্যে পুরুষ শিশুর হার প্রায় ২৩ভাগ এবং মেয়ে শিশুর হার প্রায় ২২ ভাগ। অর্থাৎ সকল বয়সী মহিলা (মেয়ে শিশুসহ) ও অনুর্ধ্ব ১৪ বছর বয়সী পুরুষ শিশুর একত্রিত হার প্রায় শতকরা ৭২ ভাগ, যা বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় তিন-চতুর্থাংশের কাছাকাছি। এই বিশাল জনগোষ্ঠীর সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে সম্ভবত আমরা চিন্তা করি খুব কম এবং উন্নয়ন প্রচেষ্টা গ্রহণ করি তার চেয়েও অনেক কম। মনে হয় যেন দায়সারা গোছের কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ, কিছু আইন প্রণয়ন এবং সরকারী ও বেসরকারীভাবে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করেই আত্মপ্রসাদ লাভ করার চেষ্টা করি। বর্তমান নিবন্ধে বাংলাদেশের মহিলা ও শিশুদের অবস্থা ও কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য কতিপয় বিষয় আলেচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের মহিলাদের চিত্র

বাংলাদেশের মহিলা ও পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান

বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ (২৮(২) অনুযায়ী রাষ্ট্র এবং গণজীবনের সর্বস্তরে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে এদেশের মহিলা সমাজ পশ্চাদপদ, উপেক্ষিত এবং সর্বক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণী। শিক্ষা, কর্মসংস্থান, পেশা, আয়, মজুরী প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের অবস্থান পুরুষের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরে।

---

* ঊর্ধ্বতন গবেষণা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

বাংলাদেশে পুরুষ ও মহিলার তুলনামূলক অবস্থানের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক তথ্য পর্যালোচনা করা যেতে পারে, যার দ্বারা মহিলা সমাজ সম্পর্কে কিছু ধারণা করা সম্ভব হবে (সারণি ১)।

সারণি-১

বাংলাদেশের পুরুষ ও মহিলার কতিপয় মৌলিক তথ্য

বিষয়	পুরুষ	মহিলা	মোট
শিক্ষার হার	৪২.০০%	২২.০০%	৩২.০০%
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার	৯৪.০০%	৬০০%	১০০.০০%
বেসরকারী শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৯২.০০	৮.০০	১০০.০০
বেসামরিক শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৩১.০১	২০.১	৫১.২
সক্রিয় বেসামরিক শ্রম শক্তি (মিলিয়ন)	৩০.৫	১৯.৭	৫০.২
বেকারত্বের হার (আধা-বেকারত্ব ব্যতীত)	২.০%	১.৯%	১.৯%
কৃষি কাজে নিয়োজিত শ্রম শক্তির হার	২.২%	০.২%	২.৪%
স্ব-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত (মিলিয়ন)	৬.৭৭	০.৯৭	৭.৭১
গড় আয়ু (বছর)	৫৮.৯	৫৮.০	৫৮.৫

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯১)

সারণিতে বর্ণিত প্রতিটি ক্ষেত্রেই মহিলাদের পশ্চাদপদতা লক্ষণীয়। পেশা, কর্মসংস্থান, এমনকি গড় আয়ুর ক্ষেত্রেও মহিলারা যথেষ্ট পিছিয়ে আছেন। কেবল ১টি ক্ষেত্রে তাঁদের পদচারণা পুরুষের চেয়ে বেশী। সেটি হলো বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্প। এই শিল্পে বাংলাদেশের প্রায় ৭৫০টি পোশাক তৈরীর কারখানার ৩,৫০,০০০ জন শ্রমিকের শতকরা ৮৫ ভাগই মহিলা (ইউনিসেফ ১৯৯০)।

বাংলাদেশের মহিলাদের সামাজিক অবস্থান

জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই একজন বাঙালী নারী প্রায় বন্দীদশায় অবস্থান করে একদিন সবার অলক্ষ্যে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। বাংলাদেশের মোট মহিলা জনসংখ্যা ৫৩.৩ মিলিয়ন; কিন্তু সামাজিক ক্ষেত্রে নারীদের প্রায় সকল কার্যক্রমই পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পৃথিবীতে তার প্রথম পদার্পণের দিনটি থেকেই সে অবাঞ্ছিত। জন্মের পর থেকেই একজন মেয়ে তার পরিবারে নানারকম বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়, যা বিভিন্ন রূপ ও মাত্রায় তার জীবনভর চলতে থাকে। এ সম্পর্কে Begum (1988) বলেন, "...The birth of a girl child is rerely celebrated by azan which reflects the community's

recognition of a baby's arrival. From early childhood she is made fully conscious of the feeling that unlike her brother who are regarded as assets to the family but she is a liability."

ধর্মীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথা অনুযায়ী তাদেরকে ধৈর্য্য ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হলেও মেয়েদের আনুষ্ঠানিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি পরিবারের এক ধরনের নিস্পৃহ ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। শৈশব থেকে কৈশোরে পা দিতেই তাকে পর্দা-প্রথা অনুসরণ করে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আশ্রয় নিতে হয়। ফলে জীবনের সামগ্রিক কর্মকান্ডে সমাজের সাথে তার সকল যোগাযোগ হয় বিচ্ছিন্ন। এ সম্পর্কে Chowdhyry বলেন, "She may not attend religious gatherings, enter a mosque or attend meeetings or festivals."

ঐতিহ্যগতভাবে একজন মেয়েকে খুব অল্প বয়সেই বিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীদের বয়স তাদের তুলনায় (গড়পড়তা সাত বৎসর) বেশী থাকে। বিয়ে বা স্বামী নির্বাচনের ক্ষেত্রে তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের তেমন কোন সুযোগ নেই। বাংলাদেশের পিতামাতা, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায়, পুত্র সন্তান লাভের প্রতি অধিক আগ্রহী এবং পুত্র সন্তান না হওয়া পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে সন্তান জন্মদান করতে থাকেন। তাঁরা পুত্র সন্তানকে বংশ রক্ষা ও তাঁদের বৃদ্ধ বয়সের নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। কৈশোর থেকেই একজন মেয়েকে রান্নাবান্না, গৃহকর্ম, ছোট ভাইবোন দেখাশুনা, মোট কথা তাকে একজন ক্ষুদে মায়ের ভূমিকা পালন করতে হয়। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তাদের প্রতিদিনের কর্মঘন্টা পুরুষদের তুলনায় বেশী হলেও তা আর্থিক মানদন্ডে পরিমাপ করা হয় না এবং তার কোন সামাজিক স্বীকৃতিও নেই। এ প্রসঙ্গে Farooque বলেন, "Women workd much longer hour as productive work than husbands but the time women spend at work is generally unnoticed, because most of it occurs in the kitchen and in expenditure-saving household work."

অর্থনীতিতে উৎপাদনের সার্বিক উপকরণসমূহ পুরুষদের হাতে ও তাঁদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনে একই পিতামাতার সন্তান হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর ভাইয়ের প্রাপ্ত সম্পত্তির তুলনায় অর্ধেক সম্পত্তি ও স্বামীর সম্পত্তির মাত্র এক-অষ্টমাংশ পান। কিন্তু সামাজিক বৈষম্য থাকায় এবং তাঁরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হওয়াতে এই আইন কদাচিৎ অনুসৃত হয়ে থাকে। ফলে বিধবা বা তালাকপ্রাপ্তা হলে একজন

মহিলাকে তাঁর পৈতৃক বা স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের অনুগ্রহে গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের মহিলাদের নিম্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার অন্যতম কারণ। যৌতুকের দাবীতে তাঁদেরকে শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হয়, এমনকি শেষ পর্যন্ত বিবাহ ভেঙ্গে যায়। প্রতিদিন সংবাদপত্রের পাতা খুললেই যৌতুকের বলি, আত্মহত্যা ও নারী নির্যাতনের করুণ চিত্র চোখে পড়ে।

শিক্ষাগত অবস্থা

শিক্ষা প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। কিন্তু বাংলাদেশে মহিলাদের শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা তাঁদের আর্থ-সামাজিক মর্যাদা তথা উন্নয়নের পথে প্রধান অন্তরায়। শিক্ষার অভাবে মহিলারা পুরুষদের পাশাপাশি তাঁদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারছেন না। ১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী মেয়ে শিশুদের মাত্র ৪৮% বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় যাদের মধ্যে প্রাথমিক স্তরে ড্রপআউটের পরিমাণ৭২%। মহিলাদের শিক্ষার হার বর্তমানে শতকরা ২২ ভাগ (বিবিএস, ১৯৯১)।

মহিলাদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা

কোন সমাজের জনগণের পুষ্টি স্বাস্থ্যগত অবস্থা তাঁদের সামাজিক অবস্থান এবং শিক্ষার সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশের মেয়েদের শিক্ষাহীনতা, অপুষ্টি ও রোগগ্রস্ততার মাত্রা দুঃখজনক ভাবে বেশি। এ সম্পর্কে Khan (1987) তাঁর গবেষণা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "এদেশের মেয়েরা বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে যায় এবং মা হয়। গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময়েও তারা প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পুষ্টির কিছুই পায় না। বাঙালী সংসারের সনাতন নিয়মে বাড়ির সবার খাওয়া হলে মেয়েরা অবশিষ্ট খাবার খায়। ফলে তাদের ভাগের খাবার প্রায় সর্বদাই পরিমাণে কম এবং গুণগত মানেও নিকৃষ্ট হয়ে থাকে। এদেশের স্বল্পবিত্ত সংসারের গর্ভবতী মায়েদের গড় ওজন সবারই প্রায় ৫০কেজির নীচে। এত ভঙ্গুর স্বাস্থ্যের মায়েদের সাধারণত গর্ভপাত, মৃত সন্তান প্রসব, দীর্ঘস্থায়ী প্রসব যন্ত্রণা ইত্যাদি অসুবিধা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। এর ফলে ক্ষীণদেহী মায়েদের শরীর আরও ভেঙ্গে যায়, আয়ু-কমে যায় স্বাভাবিকভাবে।"

এদেশের মহিলাগণ পুরুষদের চেয়ে ২৯% কম ক্যালরী গ্রহণের সুযোগ পান। মহিলাদের গড় ওজন ৫০ কেজি। শতকরা ৫০ ভাগ মহিলা অপুষ্টি, রক্তশূন্যতা, কম

ওজন প্রভৃতিতে ভোগেন বলে তাঁদের প্রসবকালীন মৃত্যুসহ রোগের সংখ্যা পুরুষের চেয়ে বেশী (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। বাংলাদেশের মহিলারা পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নন। তাঁদেরকে এক্ষেত্রে পুরুষদের কর্তৃত্ব মেনে নিতে হয়। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মহিলারা ইচ্ছে থাকলেও জন্ম নিরোধক সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ পাননা এবং অধিক সন্তান জন্ম দানে বাধ্য হয়ে অপুষ্টি ও রক্ত শূন্যতায় ভোগেন। আবার অনেকে জন্ম নিরোধক সামগ্রী গ্রহণে তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বাধ্য হন এবং বিভিন্ন প্রকার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ায় আক্রান্ত হন। পুরুষ সঙ্গীদের তুলনায় মহিলাদের স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণের হারও অনেক বেশী। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা ক্ষেত্রে সরকার কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিলেও পুষ্টি ব্যবস্থা আজও অবহেলিত রয়ে গেছে।

মহিলাদের বৈবাহিক অবস্থা ও সন্তান জন্মদান

বাংলাদেশে মহিলাদের বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছর, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ২৫ বছর। গড়ে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের পার্থক্য সাড়ে সাত বছর। যদিও মহিলাদের বিয়ের গড় বয়স ১৮ বছর, কিন্তু বিবাহিতা মহিলাদের গড়ে শতকরা ২০ ভাগ (কিশোরী বধূ) ১৫ বছরে প্রথম সন্তানের জন্ম দিয়ে থাকেন। সত্তুরের দশকে সক্ষম মহিলাদের গড় গর্ভ ধারণের হার ছিল ৭.৫, আশির দশকের শেষ ভাগে তা ৪.৯তে নেমে এসেছে, যা এখনও বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় উচ্চতর হার। এদেশের বিবাহিতা মহিলাদের শতকরা ১৭ ভাগ তাঁদের ৪০-৪৪ বছর বয়স শ্রেণীতে হয় বিধবা, না হয় তালাকপ্রাপ্তা হয়ে থাকেন। শতকরা ৬২ ভাগ গর্ভবতী মহিলা তাঁদের ১ম সন্তান ছেলে কামনা করে থাকেন এবং এতে ব্যর্থ হওয়ার ফলেই সন্তান জন্মদানের হার বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রতি বছর প্রায় ২৮,০০০ মহিলা সন্তান প্রসবকালে অথবা সন্তান ধারণজনিত বিভিন্ন অসুখের কারণে মৃত্যু বরণ করে থাকেন। প্রতি ১০০০ জীবন্ত শিশুর ক্ষেত্রে প্রসূতি মাতার মৃত্যুর হার ৪.৭ (বিবিএস, ১৯৯১)। অবশ্য ১৯৯৪ সালে এই হার কিছুটা হ্রাস পেয়ে ৪.৫ এ নেমে এসেছে।

মহিলাদের পেশা, কর্মসংস্থান ও আয়

এদেশে মহিলাদের শিক্ষার হার কম। কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদেরও বিশাল অংশ কোন প্রকার চাকরি বা কর্মসংস্থানে নিয়োজিত নন। কারণ, পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রেও মহিলাদের স্বাধীন মতামত সর্বদা কার্যকর হয়না। অনেককে আবার শিক্ষিত হয়েও বেকার থাকতে বাধ্য হতে হয়।

এদেশে গৃহকর্ম বা পরিবারের যাবতীয় কার্যাদি (যেমন রান্না-বান্না, গৃহ পরিচ্ছন্ন রাখা, কাপড় কাঁচা, সন্তান লালন-পালন, সেবা সুশ্রুষা, চাল ও আটা তৈরী, কৃষিকাজে

সহায়তা, সুচিকর্ম, প্রভৃতি) মহিলারাই সম্পন্ন করে থাকেন। কিন্তু সেগুলো আর্থিক মূল্যে নিরূপণ করা হয়না। গ্রামাঞ্চলের মহিলারা শাক-সব্জীর চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, ছাগল ও গবাদি পশু পালন, ধান মাড়াই প্রভৃতি কাজে সক্রিয়ভাবে জড়িত থাকেন। এগুলোও আর্থিক উপার্জনে ধরা হয়না। কেবল ব্যবসা বা চাকরি থেকে কৃত উপার্জনকে আয় হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৯৮৯সাল থেকে সরকারীভাবে মহিলাদের গৃহকর্ম ও পুরুষের বিভিন্ন কর্মে সহায়তাদানকে বৃহৎ সংজ্ঞায় কর্মশক্তি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ফলে দেখা যাচ্ছে যে, শহরাঞ্চলে ২৯% এবং গ্রামাঞ্চলে ৭০% মহিলা সক্রিয় কর্মশক্তির অধীনে গণ্য হচ্ছেন। পুরুষ-প্রধান পরিবারে ২৫-৫০% এবং মহিলা-পদান পরিবারে ৯০% তাঁদের জীবিকার্জনে রত বলে ধরা হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৪)। এদেশে মহিলা শ্রমিকের মজুরী অত্যন্ত অল্প। অকৃষি খাতে তাঁদের মজুরী পুরুষের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ। কৃষি খাতে তাঁরা সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরীর চেয়ে শতকরা ৬০ ভাগেরও কম মজুরী পান (আহমেদ, ১৯৮৮)।

মহিলাদের চাকরি ও কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে পুরুষরা অনেক ক্ষেত্রে বিরূপ এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন। চাকরি করলে আর্থিক দিক থেকে কন্যা ও স্ত্রী স্বাবলম্বী হলে পরিবারে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বেড়ে যাবে, এই ভেবে অধিকাংশ পিতা ও স্বামী তাঁদেরকে কর্মে ও চাকরিতে নিরুৎসাহিত করেন। ১৯৭৬ সনের এক নমুনা জরিপে দেখা যায়, ২৭০ জন পুরুষ মত প্রকাশ করেছেন যে, "মহিলাদের কর্মসংস্থান ও গৃহকর্মের সাথে (যেমনঃ সেলাই, খেলনা তৈরি, টিউশনী ইত্যাদি) সম্পৃক্ত হওয়া উচিত। এরপর স্থান ছিল শিক্ষকতা ও ডাক্তারী পেশার। তাদের ধারণা ছিল অনুরূপ পেশায় পুরুষ-সাহচর্য কম, ফলে এতে মহিলাদের সতীত্ব রক্ষা পাবে" (হাশমী, ১৯৮৭)। এই যদি হয় মহিলাদের প্রতি শহরের শিক্ষিত লোকের ধারণা, তবে গ্রামের অবস্থা কী তা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু আরো দুঃখজনক ঘটন হলো, সমান কাজে মহিলাদের দৈনিক বা মাসিক বেতন কিংবা মজুরী পুরুষদের তুলনায় কম। শিল্প কারখানায় সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ শুধু সুষ্ঠু উৎপাদন ব্যবস্থারই নয়, পেশাগত নিরাপত্তারও পূর্বশর্ত। কর্মজীবী মহিলাদের ৯০ শতাংশ গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত (হাশমী, ১৯৮৭)। জাতীয়করণকৃত শিল্প কারখানার শ্রমিকদের মাত্র ৬% মহিলা। এছাড়া নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম অবসর পান ও বেশি কাজ করেন (হাশমী, ১৯৮৭)। দারিদ্র, নদী ভাঙ্গন, উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি প্রভৃতি কারণে ইদানীং পোশাক শিল্পে মহিলারা অধিক পরিমাণে নিয়োজিত হচ্ছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানের মত সেখানেও তাঁরা নিদারুণভাবে শ্রমশোষণের শিকার। এমনকি সেখানে তাঁদেরকে লিখিতভাবে কোন নিয়োগপত্র পর্যন্ত দেয়া হয় না। এক জরিপে দেখা যায়, যেখানে ৬ শতাংশ পুরুষ কাজের পরিবেশ সম্পর্কে

অভিযোগ এনেছে, সেখানে মহিলা অভিযোগকারীর সংখ্যা ৪৯% (ILO, 1993)।

অন্যদিকে শিক্ষিতা মহিলাদের চাকরির পরিসরও মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। যেমন ঃ ব্যক্তিগত সচিব, অভ্যর্থনাকারিণী, বিমানবালা, নার্স ইত্যাদি, যা সমাজের অনেক পুরুষ ভাল চোখে দেখেন না। সাধারণভাবে সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়েও মহিলাদের তেমন কোন কর্তৃত্ব নেই।

আত্ম-কর্মসংস্থানে মহিলা

বিবিএস (১৯৯৫) কর্তৃক আত্ম-কর্মসংস্থান (Self Employment) এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে, "A self employment or own account work is, a person who operates enterprise or business on his own account or operates it jointly with others in form of partnership. A self employed person may or may not hire workers to assist him in his enterprise".

বাংলাদেশের মোট কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর মাত্র ২২% আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত। সংখ্যার দিক থেকে তা ৭৭,১২,০০০; যার মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৬৭,৭২,০০০ এবং মহিলার সংখ্যা ৯,৪০,০০০। তবে মহিলাদের ক্ষেত্রে শহুরে মহিলাদের তুলনায় গ্রামীণ মহিলারা প্রায় ৬৭ গুণ বেশী আত্ম-কর্মসংস্থানে নিয়োজিত রয়েছেন (বিবিএস, ১৯৯০)।

বয়সের বিন্যাসে দেখা যায়, উপরে বর্ণিত ৯,৪০,০০০ আত্ম-কর্মসংস্থানে রত মহিলার মধ্যে ১৫-৩৯ বছর বয়স্ক ৭,৫৯,০০০, ৪০-৪৫ এ বয়সসীমায় ৭৪ হাজার এবং ৪৫-৭০ বয়স সীমায় ১,০৬,০০০জন। তাঁদের সবাই গড়ে ১৩.৭ ঘন্টা/সপ্তাহে আত্ম-কর্মসংস্থানের কাজে ব্যয় করেন (বিবিএস, ১৯৯৫)।

সারণি ঃ ২

আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিবন্ধকতা

প্রতিবন্ধকতাসমূহ	শতকরা হার
সুযোগের অভাব	৪০
সামাজিক ও ধর্মীয় প্রথা এবং ধ্যান ধারণা	২৮
সাংসারিক দায়িত্ব	১৬
অসুস্থতা	১৬
মোট	১০০

(সূত্র ঃ সিরডাপ, ১৯৯৩)

রাজনীতিতে মহিলাদের অবস্থান

যদিও বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী; কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্যায় থেকে শুরু করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন স্তরে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা অত্যন্ত গৌণ।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাবলয়ের মধ্যে নারীদের এই অধঃস্তনতা ও প্রান্তিকতার পাশাপাশি রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অপরাপর অভিব্যক্তি, যেমন রাজনৈতিক দল ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যেও একই অবস্থা পরিদৃষ্ট। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, মহিলা সম্পাদিকার পদটি বাদে প্রায় প্রতিটি দলের সম্পূর্ণ কমিটিই পুরুষদের দখলে। আশির দশক থেকে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হয় সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে দু'জন মহিলা যথাক্রমে শেখ হাসিনা ও বেগম খালেদা জিয়া প্রধান রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ এবং বি,এন,পির'র সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। যদিও বাংলাদেশের বর্তমান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সরকার প্রধান ও সংসদের বিরোধীদলের নেতা যথাক্রমে উক্ত দু'জন মহিলা, কিন্তু সামগ্রিকভাবে তা জাতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রতিফলন নয়। বাংলাদেশের ৪টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাহী কমিটিসমূহে মহিলাদের অবস্থান সারণী ৩ এ দেখানো হলো।

সারণি- ৩

বাংলাদেশের ৪টি বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাহী কমিটি সমূহে মহিলাদের অবস্থান

দল		সদস্য	সদস্য
বি. এন. পি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	১৫	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	৭৫	১১
আওয়ামী লীগ	প্রেসিডিয়াম এবং সেক্রেটারিয়েট	১৩	৩
	কার্য নির্বাহী কমিটি	৬৫	৬
জাতীয় পার্টি	জাতীয় স্থায়ী কমিটি	৩০	১
	জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটি	১৫১	৪
জামায়াতে ইসলাম	মজলিস-ই-শূরা	১৪১	–
	কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি/ মজলিস-ই-আমেলা	২৪	–

(উৎস ঃ রাজনৈতিক দলের অফিস সমূহ থেকে সংগ্রহ, ডঃ দিলারা চৌধুরী এবং প্রফেসর আল মাসুদ হাসানুজ্জামান, ১৯৯৩।)

নির্বাচনী আচরণের ওপর আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, শহরের অভিজাত এলাকার নারীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৮জন এবং গ্রামীণ নিম্নবিত্ত পরিবারের শতকরা ৩৪ জন নারী নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। কিন্তু শহরের অভিজাত এবং গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী পরিবারের যেসব নারী নির্বাচনে ভোট প্রদান করেন, তাঁদের মধ্যে শতকরা ৬৬ জন নারী সচেতন রাজনৈতিক অভিপ্রায় ও বিবেচনা অনুযায়ী ভোট দেন। বাকী ৩৪ জন ভোট দেন আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব কিংবা স্বামী, পিতা বা ভাইয়ের ইচ্ছায়। এর পাশাপাশি শহরের বস্তি ও গ্রামীণ নিম্নবিত্তদের মধ্যেকার শতকরা ১২ জন নারী নিজের ইচ্ছায় বা বিবেচনায় ভোট দেন। সমাজের এই স্তর থেকে শতকরা ৮৮ জন ভোট প্রদান করেন স্বামী বা পিতার ইচ্ছা ও নির্দেশে (হক, ১৯৮৭)।

নারী নির্যাতন, দেহজীবিকা ও নারী পাচার

ব্যাপক গণদারিদ্র, ক্ষুধা, নির্যাতন, সমাজচ্যুতি প্রভৃতি কারণে অনেক মেয়ে পতিতাবৃত্তিতে নামছে। তাছাড়া দালাল ও অসৎ লোকের খপ্পরে পড়েও অনেক দরিদ্র গ্রাম্য মহিলা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। খান ও আরেফিন (১৯৮৮) ঢাকা শহরের নটীনগর ও নারায়নগঞ্জের আনন্দবাজার পতিতালয়ের পতিতাদের ওপর যে জরিপ করেন, তাতে দেখা যায় ঃ এ দু'টি পতিতা পল্লীতে মোট পতিতার সংখ্যা প্রায় ৪০০০ যাদের শতকরা ৭৫ ভাগের বয়স ১৫-৩০ বছরের মধ্যে। উক্ত জরিপ থেকে আরো দেখা যায়, এসব পতিতার আয়ের একটা বিরাট অংশ দালাল, সর্দারনী ও অনুমোদনপত্র প্রদানে সহায়তাকারী মাস্তানরা ভোগ করে থাকে। তাছাড়া তাদের স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসার কোন সুযোগ নেই বললেই চলে।

বাংলাদেশে নারী উন্নয়ন কার্যক্রম

১৯৭১ সনে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত দুঃস্থ, নির্যাতিতা মহিলাদের পুনর্বাসন ও তাঁদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক তথা জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮নং অনুচ্ছেদে জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে। গত আশির দশক থেকে সরকার মহিলাদেরকে গৃহকর্মের পাশাপাশি আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন।

দ্রুত ও সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সরকারী পর্যায়ে নারী উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত। সত্তুর দশকের শেষ ভাগে সরকার নারী উন্নয়নের বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। সে আমলে মহিলা সম্পর্কিত নীতি, পরিকল্পনা ও কার্যক্রমে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়ন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ নগণ্য।

সরকারী পর্যায়ে গৃহীত উদ্যোগ

১৯৭১ সাল হতে এ পর্যন্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে সরকার যে সমস্ত সুস্পষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, তা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

- উইমেন রিহেবিলিটেশন বোর্ড গঠন-১৯৭১
- বাংলাদেশ সংবিধানে মহিলাদের সম উন্নয়নের নির্দেশ-১৯৭২
- উইমেন রিহেবিলিটেশন ও ফাউন্ডেশন গঠন-১৯৭৪
- জাতীয় মহিলা সংস্থা সৃষ্টি- ১৯৭৬
- মহিলা বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি-১৯৭৬
- মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় সৃষ্টি-১৯৭৮
- যৌতুক প্রথা রহিতকরণ আইন-১৯৮০
- সরকারী ও আধা-সরকারী সকল ক্যাডারে মহিলা কর্মকর্তা নিয়োগ (কোটা ১০%)-১৯৮২
- সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানে মহিলা কর্মচারী নিয়োগ (১৫%)-১৯৮৩
- নারী নির্যাতন নিরোধ অধ্যাদেশ-১৯৮৩
- মহিলা বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ পরিদপ্তর-১৯৮৪
- বাল্যবিবাহ নিরোধ সংশোধিত অধ্যাদেশ-১৯৮৪
- পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ-১৯৮৫

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলোতে মহিলাদের উন্নয়নের খাত থাকলেও কার্যত তা এখনও সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হয়নি। পূর্ববর্তী পঞ্চবার্ষিকীগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে সেগুলোর বাস্তবায়নে রয়েছে অনেক প্রভেদ, দ্বন্দ্ব ও অসঙ্গতি। যথা ঃ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের উন্নয়নের কথা থাকলেও তা লিঙ্গীয় ভিত্তিতে (Gender Basis) করা হয়নি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকীতে দারিদ্র দূরীকরণে নারীদের সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা উল্লেখ ছিল। এছাড়া পুঁজি-ঘন শ্রমশক্তির পরিবর্তে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর জোর দেয়া সত্ত্বেও মহিলাদের জন্য সঠিক টেকনোলজির অভাবে অভিজ্ঞ মহিলাদের কাজে লাগাতে পারেনি। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মহিলাদের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষভাবে তাঁদের উন্নয়নের ওপর জোর দেয়া হয়। কিন্তু কার্যত এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য আসেনি এবং লিঙ্গীয় বৈষম্যও দূর করা সম্ভব হয়নি।

দারিদ্র দুরীকরণে মহিলাদের দক্ষতাবৃদ্ধি, টেকনিক্যাল জ্ঞান বিতরণ ও কর্মে নিয়োগের জন্য তাঁদেরকে আরো সুযোগ দিতে হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে মহিলাদের ভবিষ্যতের অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

- উন্নয়ন কর্মকান্ডের সর্বস্তরে নারীদের সম্পৃক্তকরণ
- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি ও ড্রপআউট রোধকরণ
- কৃষি, শিল্প, চাকরি,ব্যবসায় নারীদের সুযোগ সম্প্রসারিতকরণ
- শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্যক্রমে আনার জন্য নারীদের স্বনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠার এবং সেজন্য তাঁদের ঋণদানের সুযোগ প্রদান
- চাকরি ক্ষেত্রে নারীদের কাজের পরিবেশের উন্নয়ন এবং নারীদের মজুরী/ বেতনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান অসমতা ও বৈষম্য দূরীকরণ
- সর্বগ্রাসী দরিদ্র পরিবেশ থেকে নারীদের রক্ষাকরণ
- দারিদ্রের চক্রে আবদ্ধ স্বাস্থ্যহীন মহিলাদের স্বাস্থ্য যত্নের ওপর জোর প্রদান
- প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলাদের উপকারের সাথে তাঁদের লাভবান হওয়ার সুযোগ প্রদান
- নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নের তফাৎ দূরীকরণ

গ্রামীণ মহিলাদের উন্নয়নে কার্যরত সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা

বাংলাদেশে মহিলাদের কল্যাণ সাধন ও উন্নয়নে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বর্তমানে কার্যরত রয়েছে। বাংলাদেশের ৩০০টি থানায় মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দপ্তর রয়েছে। এছাড়া সমাজ সেবা অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড প্রধানত গ্রামীণ মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে ঋণ প্রদানসহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য, শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (কুমিল্লা) এবং পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বগুড়া) মহিলাদেরকে আত্ম-কর্মসংস্থানে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা করে থাকে। বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক, প্রশিকা, প্রবর্তনা, সপ্তগ্রাম নারী সংঘ, কারিতাস প্রভৃতি সংস্থা ঋণ প্রদানসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করে যাচ্ছে। এসব কার্যক্রমের শতকরা ৭০ ভাগ গ্রামীণ এলাকায় পরিচালিত হচ্ছে। শহরে কেবল বস্তি এলাকায় বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম চালু আছে। সমাজ সেবা অধিদপ্তরের 'শহর সমাজ সেবা কর্মসূচি' এবং মহিলা অধিপ্তরের কিছু কর্মসূচি ছাড়া তেমন কোন সরকারী কার্যক্রম শহর এলাকায় চালু নেই।

বাংলাদেশের শিশু

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ ভাগ ০-১৪ বছর বয়সী শিশু। এদের অধিকাংশ অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা ও নানা রোগের শিকারে পরিণত হয়। মহিলা শিশুর অবস্থা পুরুষ শিশুর তুলনায় অধিকতর খারাপ। কেবল পুরুষদের কাছেই নয়, মহিলাদের কাছেও মহিলা শিশুগণ উপেক্ষিতা হয়ে থাকে।" পুত্র সন্তানের প্রাধান্যের পিছনে শক্তিশালী অর্থনৈতিক ফ্যাক্টর রয়েছে। শৈশবে মেয়ে শিশুরা পরিবারের জন্য অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হলেও (কারণ তারা গৃহস্থালীর কাজ করে) পুরুষ শিশুরা বয়স বাড়ার সাথে সাথে পরিবারের জন্য আর্থিক কার্যকর বা উৎপাদনশীল বলে গণ্য হয়। আর মেয়েরা যে কাজ করে তা অস্পষ্ট বা সে কাজ সরাসরি কোন অর্থনৈতিক সুবিধা হিসেবে প্রতীয়মান হয় না" (Mannan, ১৯৮৮)।

পুরুষ শিশু বনাম মহিলা শিশু ঃ সামাজিক দৃষ্টিকোণ ও শিক্ষা

বাংলাদেশে মাত্র শতকরা ৮ ভাগ মহিলা তাঁর পরবর্তী সন্তানকে মেয়ে শিশু হিসেবে কামনা করেন (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। এক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে যে ধারণা কাজ করে তা হলো, পুরুষ শিশু বড় হয়ে তাঁকে রোজগার করে খাওয়াবে, বৃদ্ধকালে আশ্রয় দেবে। কিন্তু মহিলা শিশু বড় হলে অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম তো হবেই না, উপরন্ত তাকে বিয়ে দিতে বিরাট অঙ্কের অর্থ ব্যয় হবে। এক কথায়, মহিলা শিশুকে এ সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কর্ম বা উপার্জনের সহায়ক বিবেচনা না করে তাকে ঝামেলা বা বোঝা হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। ফলে পুরুষ শিশুর তুলনায় মহিলা শিশুর আদর যত্ন, পুষ্টিকর খাবার, চিকিৎসা সুযোগ ইত্যাদি কম প্রাপ্তি ঘটে এবং কম ক্যালরী গ্রহণের সুযোগ পায়। অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মহিলা শিশুরা পুরুষ শিশুদের তুলনায় ১৬% ক্যালরী কম গ্রহণের সুযোগ পায় (ইউনিসেফ, ১৯৯৩)। এই বয়সী মহিলা শিশুর মৃত্যুর হার পুরুষ শিশুর তুলনায় ২৭% বেশী।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মহিলা শিশু উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ কম পেয়ে থাকে। যদিও বাংলাদেশে মোট স্কুল গমনযোগ্য শিশুদের ৭৭% স্কুলে ভর্তি হয়, তাদের মধ্যে মহিলা শিশুর ভর্তির হার ৫০%। ১০-১৪ বছর বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুদের ২৩% এবং মহিলা শিশুদের ১০% মাত্র স্কুল গমনে রত থাকে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পুরুষ ও মহিলা শিশুর কলেজ গমন অনুপাত ৬০ ঃ ৪০ জন। পুরুষ শিশুদের তুলনায় মহিলা শিশুদের পথে ঘাটে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিতকরণ এবং অপহরণ ও পাচারকরণের ঘটনাও এদেশে অনেক বেশী।

প্রতিটি শিক্ষার স্তরেই মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় পশ্চাদপদ। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীর হার যথাক্রমে ৪৫%, ৩৫% ও ২৮%।

শিক্ষার প্রতিটি পর্যায়ে তাদের ড্রপ আউটের পরিমাণও বেশি। তাছাড়া প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মেয়ে শিশু পরবর্তী সুনির্দিষ্ট কর্মসূচির অভাবে নিরক্ষরতায় নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। মক্তব, মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিশ্ববিদালয়সমূহেও মহিলা শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য (সারণি ৪)।

সারণি ঃ ৪

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাদেশের নারী-পুরুষের তুলনামুলক অবস্থান

শিক্ষার স্তর	নারী	পুরুষ
প্রাথমিক	৪৫%	৫৫%
মাধ্যমিক	৩৫%	৬৫%
উচ্চ মাধ্যমিক	২৮%	৭২%
বিশ্ববিদ্যালয়	২০%	৮০%
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ড্রপ আউটের হার		
১ম শ্রেণী	২০.১%	১৮.১%
২য় শ্রেণী	১২.৭%	১৯.৪%
৩য় শ্রেণী	১৫.২%	১৫.৯%
৪র্থ শ্রেণী	১২.৩%	১৭.৯%
৫ম শ্রেণী	১১.৩%	১০.৮%

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯২)

শিশুর স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও রোগাক্রান্ততা

১৯৯১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতিবছর ৩৬ লক্ষ শিশু জন্ম নেয়, যাদের মধ্যে জন্মের প্রথম মাসে ১ লক্ষ ৮০ হাজার শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সর্বমোট প্রায় ৪ লক্ষ শিশু ২ বছরের মধ্যেই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয় এবং সর্বমোট ৭ লক্ষ শিশু অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সেই মারা যায় (Ahmed, 1995)। এরূপ উচ্চ হারে মৃত্যুর কারণ খুঁজতে গেলে প্রথমেই নানা প্রকার অসুস্থতা দেখা যায়। আর

অসুস্থতা সৃষ্টিকারী বিষয়গুলো হচ্ছে মায়েদের অপুষ্টি, অশিক্ষা, মৌলিক স্বাস্থ্যজ্ঞানের অভাব, প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব, বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব প্রভৃতি, এবং এগুলোর মূল শেকড় নিহিত রয়েছে দারিদ্র ও অপর্যাপ্ত মানব উন্নয়নের মাঝে। অবশ্য আশার কথা এই যে, ১৯৮৫ সালের তুলনায় ১৯৯৩ সালে অনূর্ধ্ব ১ বছর বয়সী শিশু মৃত্যুর সংখ্যা প্রতি হাজারে ১১৬ জনের স্থলে ৮৯ জনে হ্রাস পেয়েছে, কারণ এ সময়ে ইপিআই কর্মসূচি শতকরা ২ ভাগ থেকে শতকরা ৭৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৫)। সারণি ৫ এ বাংলাদেশে সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচির তথ্য তুলে ধরা হলো। বিশাল হারে এদেশে অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশু মারা যায়। এসব মৃত্যুর প্রধান কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো (সারণি ৬)।

সারণি ঃ ৫

গ্রাম ও শহরাঞ্চলে অনুর্ধ্ব ২ বছর বয়স্ক শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের জন্য টীকা ও ইনজেকশন প্রদান কর্মসূচির সফলতা, ১৯৯৫ (শতকরা হারে)

টীকা/ইনজেকশন	দাগ/ডোজ	গ্রামাঞ্চল			শহরাঞ্চল		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
ডিপিটি ও পোলিও	১ম	৮৩.৪	৮০.০	৮১.৮	৮৭.৫	৮৫.৫	৮৬.৭
	২য়	৭৭.২	৭৫.২	৭৬.২	৯১.২	৮৫.৯	৮৮.৮
	৩য়	৭৪.৪	৭৩.০	৭৩.৯	৮৩.৬	৭৮.৭	৮১.৪
হাম	-	৭৩.২	৭০.২	৭২.৩	৭৮.৭	৭৩.৯	৭৬.৫
বিসিজি	–	৭৩.৬	৬৮.৯	৬৯.১	৭৮.১	৭৫.০	৭৬.৭
ধনুস্টংকার ইনজেকশান (শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের)	১ম	৭০.৭	৭৩.০	৭১.৮	৭৩.৩	৭৬.৩	৭৪.৫
	২য়	৫১.৮	৫৪.৮	৫৩.৩	৬৩.৩	৬২.১	৬২.৬

(সূত্র ঃ বিবিএস, ১৯৯৫)

সারণি ঃ ৬

অনূর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুর কারণ ও শতকরা হার

কারণ	শহকরা হার
অপুষ্টি	১৭.০০
ডায়রিয়া	১৩.০০
হুপিং কাশি	২.০০
অপূর্ণ জন্ম/স্বল্প জন্ম ওজন	১১.০০
ধনুষ্টংকার	৮.০০
অন্যান্য তীব্র শ্বাস সংক্রমণ	১৮.০০
হাম	৭.০০
অন্যন্য অসুখ	২৪.০০
মোট	১০০.০০

(সূত্র ঃ Planning Commission : Reaching the People, 1993)

অনূর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশুদের অপুষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর পুষ্টিজনিত জরীপ, ১৯৯২ এর তথ্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। সারণি ৭ এ গোমেজ শ্রেণীকরণ দ্বারা বিষয়টি উপস্থাপিত হলো ঃ

সারণি ঃ ৭

অনূর্ধ্ব ৬ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে অপুষ্টির বিদ্যমানতা

(গোমেজ শ্রেণীকরণ)

অপুষ্টির অবস্থা	শিশুদের শতকরা ভাগ		
	পুরুষ	মহিলা	মোট
সাধারণ	৬.২	৬.২	৬.২
নিম্ন (১ম ডিগ্রী)	৪০.৬	৩৮.৯	৩৯.৮
মাঝারি (২য় ডিগ্রী)	৪৬.৯	৪৭.৪	৪৭.২
তীব্র (৩য় ডিগ্রী)	৬.৩	৭.৪	৬.৮
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

(সূত্র ঃ BBS, 1992)

উপরি-উক্ত সারণির তথ্যে দেখা যাচ্ছে যে, মাঝারি ও তীব্র অপুষ্টির ক্ষেত্রে পুরুষ শিশুর তুলনায় মহিলা শিশুরা বেশী ভুক্তভোগী।

বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত সম্প্রসারিত টীকা দান কর্মসূচি (ইপিআই) কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, যার ফলে শিশুদের মারাত্মক ৬টি রোগ, (যথা হাম, যক্ষা, পোলিও, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি ও তীব্র স্বাস কষ্টজনিত রোগ) থেকে বর্তমানে এদেশের শিশুরা মুক্তি লাভ করছে। লক্ষ্যণীয় য়ে, এক্ষেত্রেও পুরুষ শিশুর টীকা গ্রহণের হার মহিলা শিশুর চেয়ে বেশী (সারণি ৫)।

শিশু শ্রম

বাংলাদেশে ১০ বছরের উর্ধ্ববয়সীদেরকে শ্রমশক্তির আওতায় সাধারণত গণ্য করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এর চেয়ে কম বয়সী অর্থাৎ ৫ বছর বয়স থেকেই শিশুরা বিভিন্ন শ্রম প্রদানে নিযুক্ত হয়। অবশ্য এসব শিশুর শ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন করা হয়না। তবু যে কোন শিল্প কারখানায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং কৃষিকাজে সহায়ক শক্তি হিসেবে এরা শ্রম প্রদান করে থাকে। ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের মোট বেসামরিক কর্মশক্তি (১০ বছর ও তদূর্ধ্ব) সংখ্যায় ৫,০৭,৪৪,০০০। এর মধ্যে ১০-১৪ বছর বয়সীদের সংখ্যা ৪১,০৭,০০০, যা মোট কর্মশক্তির ৮.১%। কিন্তু এই সংখ্যা যদি ৫-১৪ বছরে হিসেব করা যায়, তাহলে সংখ্যায় তা হবে ১,০৯,২৭,০০০, যা মোট কর্মশক্তির ২১.৫%। এই বয়সী কর্মশক্তির মধ্যে মহিলা শিশুদের সংখ্যা বেশী এবং তা গ্রামীণ ও শহুরে উভয় ক্ষেত্রেই পুরুষ শিশুর তুলনায় বেশী। সারণি ৮ এ সংখ্যা ও শতকরা হার দেখানো হলো।

সারণি ঃ ৮

বেসামরিক শ্রমশক্তি ও শিশু শ্রম, ১৯৮৯

(সংখ্যা হাজারে)

মোট বেসামরিক শ্রমশক্তি			শিশু শ্রম					
			৫-১৪ বছর		৫-৯ বছর		১০-১৪ বছর	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
সর্বমোট	৫০৭৪৪	১০০.০	১০৯২৭	২১.৫	৬৮২০	১৩.৪	৪১০৭	৮.১
পুরুষ	২৯৭৫৯	১০০.০	৫৯৯০	২০.১	৩৫৪৮	১১.৯	২৪৪২	০.২
মহিলা	২০৯৮৫	১০০.০	৪৯৩৮	২৩.৫	৩২৭৩	১৫.৬	১৬৬৫	৭.৯
গ্রামীণ								
সর্বমোট	৪৫০৬২	১০০.০	৯৯৯১	২২.২	৬১৯১	১৩.৭	৩৮০০	৮.৪
পুরুষ	২৫৫৬৫	১০০.০	৫৪৯৮	২১.৫	৩২৪৫	১২.৭	২২৫৩	৮.৮
মহিলা	১৯৪৯৬	১০০.০	৪৪৯১	২৩.০	২৯৪৫	১৫.১	১৫৪৬	৭.৯
শহুরে								
সর্বমোট	৫৬৮২	১০০.০	৯৩৬	১৬.৫	৬২৯	১১.১	৩০৭	৫.৪
পুরুষ	৪১৯৩	১০০.০	৪৯০	১১.৭	৩০২	৭.২	১৮৮	৪.৫
মহিলা	১৪৮৯	১০০.০	৪৪৬	৩০.০	৩২৮	২২.০	১১৮	৭,৯

* ১০ বছর ও তদূর্ধ্ব

(সুত্র ঃ বিবিএস, ১৯৮৯)

বাংলাদেশে বিদ্যমান শিশু সংক্রান্ত আইন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৮(৩) এ বর্ণিত যে, ''নারী বা শিশুর অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত করিবেনা।'' এছাড়া সংবিধানের অপর কয়েকটি অনুচ্ছেদে শিশু সংক্রান্ত বিধান সংযুক্ত। ১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হবে এতিমদের অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য লাভ নিশ্চিত করা। ১৭ অনুচ্ছেদে বলা

হয়েছে, রাষ্ট্র সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব বলে গণ্য করবে।

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। শিশু অধিকার সনদে ১টি প্রস্তাবনা, ৩টি ভাগ এবং ৫৪টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। শিশু অধিকার সনদ বিশ্লেষণ করলে প্রধানত ৪ প্রকারের অধিকার বলবৎকরণের বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়। সেগুলো হলো ঃ

ক) শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার

খ) ক্ষতিকর পরিবেশ ও শোষণ থেকে রক্ষা পাবার অধিকার

গ) মতামত প্রকাশ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণের অধিকার

ঘ) শারীরিক ও মানসিক উন্নয়নের অধিকার

বাংলাদেশে প্রায় ২৫টি আইন, এ্যাক্ট ও অর্ডিন্যান্স শিশু অধিকার সংরক্ষণে বলবৎ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আইন/এ্যাক্টসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো ঃ

১। দি পেনাল কোড, ১৮৬০ (শিশুদের সম্মতি, অপহরণ সংক্রান্ত)

২। দি ডিভোর্স এ্যাক্ট, ১৮৬৯ (শিশু সন্তানের ভরণ-পোষণ ও শিক্ষা ব্যয় সংক্রান্ত)

৩। দি কোড অব ক্রিমিনাল প্রসিডিউর, ১৮৯৮

৪। দি মাইন্স এ্যাক্ট, ১৯২৩

৫। দি চাইল্ড ম্যারেজ রেসট্রেইন্ট এ্যাক্ট, ১৯২৯

৬। দি সাপ্রেশান অব ইম্‌মোরাল ট্রাফিক এ্যাক্ট, ১৯৩৩

৭। দি চিলড্রেন (প্লাজিং অব লেবার) এ্যাক্ট, ১৯৩৩

৮। দি এমপ্লয়মেন্ট অব চিলড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৩৮

৯। দি ম্যাটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট, ১৯২৯

১০। দি মিনিমাম ওয়েজেস অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১

১১। দি শপস্ এ্যান্ড এস্টাবলিশমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৬৫

১২। দি ফ্যাক্টরিজ এ্যাক্ট, ১৯৬৫

১৩। দি চিলড্রেন এ্যাক্ট, ১৯৭৪

১৪। ইউনিভার্সাল সল্ট আয়োডাইজেশন লেজিসলেশান এ্যাক্ট, ১৯৮৯ (আয়োডিনের অভাব দূরীকরণ সংক্রান্ত)

১৫। প্রাইমারী এডুকেশন (কম্পালসারি) এ্যাক্ট, ১৯৯০

১৬। ব্রেষ্ট মিল্ক সাবস্টিটিউটস (রেগুলেশান অব মার্কেটিং) অর্ডিন্যান্স-১৯৯২

বিপন্ন শিশু

১৯৯০ সালে শিশুদের জন্য বিশ্ব সম্মেলন (World Summit for Children) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিপন্ন শিশু বা Vulnerable Children শ্রেণীকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং নিম্নোক্ত ৭ প্রকারের শিশুকে বিপন্ন শিশু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় ঃ

১। পথশিশু

২। কর্মজীবী শিশু

৩। শিশু-পতিতা

৪। অপব্যবহার ও অবহেলার শিকার মাতৃপিতৃহীন পরিত্যক্ত শিশু

৫। প্রতিবন্ধী শিশু (শারীরিক ও মানসিক)

৬। সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশু

৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার শিশু

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে সশস্ত্র সংঘাতের শিকার শিশু ব্যতীত সকল প্রকার বিপন্ন শিশুর সংখ্যা পর্যাপ্ত। কিন্তু বাংলাদেশে এদের প্রকৃত সংখ্যা আজও গণনা করা হয়নি। কেবল প্রতিবন্ধী শিশুদের ক্ষেত্রে একটি হিসেব পাওয়া যায়। তা হলো ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৫ ভাগ শিশু প্রতিবন্ধী। এদের মধ্যে ৪২% দৃষ্টি সংক্রান্ত, ২৬% শ্রবণ সংক্রান্ত, ১৮% শারীরিক পঙ্গুত্ব সংক্রান্ত এবং ১৪% মানসিক প্রতিবন্ধী (সমাজ সেবা অধিদপ্তরের রিপোর্ট, ১৯৯২)।

শিশুদের উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারে গৃহীত কার্যক্রম

ক) বাংলাদেশ সরকার শিশুদের (৬-১০) বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ১৯৯১ ও ৯২ সাল থেকে সারাদেশে চালু করেছে।

খ) ফুড ফর এডুকেশন নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা প্রতিটি থানার ১টি করে ইউনিয়ন হিসেবে মোট ৪৬০টি ইউনিয়নে কার্যকর রয়েছে। এতে দুঃস্থ

পরিবারের ৬-১০ বছর বয়স্ক ১জন শিশুর জন্য মাসে ১৫ কেজি এবং ২ বা ততোধিক শিশুর জন্য মোট ২০কেজি গম প্রদান করা হচ্ছে।

গ) মেয়ে শিশুদের জন্য অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা এবং অষ্টম-দশম শ্রেণীর মেয়ে শিশুদের জন্য শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রদান কর্মসূচি চালু করা হয়েছে।

ঘ) বাংলাদেশের মোট ৭০টি এতিম খানায় মোট ৯,২০০ শিশুকে (৫-৯ বছর বয়সী) শিক্ষা, ভকেশনাল ট্রেনিং, পুনর্বাসন, প্রভৃতি বিষয়ে সহায়তা করা হচ্ছে। এগুলোর নাম দেয়া হয়েছে শিশু সদন (ইউনিসেফ রিপোর্ট, ১৯৯৫)। কিছু শিশু সদনকে বর্তমানে 'শিশু পল্লী' তে রূপান্তরিত করা হচ্ছে, যার সংখ্যা বর্তমানে ২৩টি করা হয়েছে (ইউনিসেফ, ১৯৯৫)।

ঙ) সরকার শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগ (হাম, ধনুষ্টংকার, হুপিংকাশি, তীব্র শ্বাস কষ্ট, যক্ষা, পোলিও) প্রতিরোধের জন্য বিনামূল্যে সারাদেশে ইপিআই কর্মসূচির মাধ্যমে টীকা ও ইনজেকশান দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

৫। বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে পরিত্যক্ত ও পঙ্গু শিশুদের চিকিৎসা বাবদ সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ১৯৯৩-৯৪)।

বেসরকারী উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহ

বাংলাদেশে কতিপয় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) শিশুদের বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নে কার্যরত আছে। এদের মধ্যে ব্র্যাক নন-ফরমাল এডুকেশন এর মাধ্যমে সারাদেশে ৩০,০০০ বিদ্যালয়ে অনূর্ধ্ব ১০ বছর বয়সী শিশুদেরকে (প্রতি বিদ্যালয়ে ৩০ জন শিশু) শিক্ষা প্রদান করছে (ব্র্যাক, ১৯৯৩)।

'ইউসেপ' নামক অপর একটি এনজিও সারাদেশের ২২টি সাধারণ ও ৩টি কারিগরী স্কুলে তাদের কারিগরী ও সাধারণ শিক্ষা অনূর্ধ্ব ১৬ বছর বয়সী শিশুদেরকে প্রদান করছে, যেখানে মোট ১২,০০০ শ্রমজীবী শিশু শিক্ষা/প্রশিক্ষণরত আছে (ইউসেপ, ১৯৯৫)।

'সেফ দি চিলড্রেন' নামে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা কর্তৃক পরিচালিত তিনটি প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশুদের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে বহুপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

'ইউনিসেফ' এর বাংলাদেশ দপ্তর থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, ইপিআই কর্মসূচি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিশুদের জন্য অর্থের যোগান দিয়ে যাচ্ছে।

এছাড়া, আরও অনেকগুলো বেসরকারী দেশী ও বিদেশী প্রতিষ্ঠান এদেশে শিশু উন্নয়ন কার্যক্রমে রত আছে। এগুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় সাধনের জন্য 'বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম' নামে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে মহিলা ও শিশু (০-১৪ বছর) এর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও অধিক। কিন্তু এই দু'টি জনগোষ্ঠী এখনও যথেষ্ট উপেক্ষিত, অনগ্রসর এবং পশ্চাদপদ শ্রেণী। এদেশে মহিলারা সকল ক্ষেত্রেই পুরুষের তুলনায় কম সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীও বটে। এদের বেশীর ভাগের প্রধান পেশা গৃহকর্ম। গৃহকর্মের যাবতীয় দায়-দায়িত্বের জন্য তাদেরকে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়, কিন্তু আর্থিক মূল্যে তাদের শ্রম নিরূপিত হয়না। শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে তারা পুরুষের প্রায় অর্ধেক। পেশা গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাধীন নন। মহিলা প্রধান পরিবারে এদেরকে সংসার পরিচালনার যাবতীয় দায় দায়িত্ব পালন করতে হয়। স্বাস্থ্য, পুষ্টি,ক্যালরী গ্রহণের ক্ষেত্রে এঁরা কম সুবিধা প্রাপ্ত। বাংলাদেশে এঁদের জন্য যথেষ্ট আইন থাকলেও তার বাস্তবায়ন খুবই কম। বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় পুরুষকেন্দ্রিকতা, সামাজিক রীতি-নীতি লোকাচার, ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে এরা এখনও প্রান্তিক গোষ্ঠী হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে।

বাংলাদেশে ০-১৪ বছর বয়স্ক শিশুর হার শতকরা ৪৫ভাগ। এদের মধ্যে পুরুষ শিশুগণ মহিলা শিশুদের তুলনায় বেশী সুবিধাপ্রাপ্ত ও অগ্রসর শ্রেণী। সামাজিকভাবে মহিলা শিশুর জন্ম এখনও আকাঙ্ক্ষিত বিষয় নয়। তবে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত মহিলাদের অবৈতনিক শিক্ষা, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি, মহিলাদের অষ্টম-দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রে উপ-বৃত্তি প্রদানের ফলে মহিলা শিশুদের শিক্ষার হার অনেক দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিশুদের জন্য এদেশে বহু আইন বিদ্যমান থাকলেও এরা এদের অধিকারসমূহ থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বঞ্চিত। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত শিশু অধিকার সনদে বাংলাদেশ একটি স্বাক্ষরদাতা রাষ্ট্র। বর্তমানে শিশুদের কল্যাণে সরকার বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। কার্যক্রমের মধ্যে ইপিআই কর্মসূচি, আয়োডিন লবণ ব্যবহার, এতিমদের জন্য শিশু সদন, বিপন্ন ও প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সার্বিকভাবে এখন পর্যন্ত গৃহীত ও সম্পাদিত কার্যক্রম মহিলা ও শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত নয়।

তথ্য নির্দেশিকা

আহমেদ আবদাল, (১৯৮৮), *বিভিন্ন পেশায় নারী,* শিশু দিগন্ত জার্নাল, ঢাকা ঃ ইউনিসেফ।

ইউসেপ, (১৯৯৫), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯০), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৩), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৪), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

ইউনিসেফ, (১৯৯৫), *বাংলাদেশের নারী ও শিশু,* ঢাকা।

খান, জারিনা রহমান ও আরোফিন, হেলাল উদ্দিন, (১৯৯২), *পতিতা নারী,* ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (১৯৭২), *বাংলাদেশের সংবিধান-১৯৭২,* ঢাকা ঃ বাংলাদেশ সরকারী প্রেস।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৮৯), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯০), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯২), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯৫), *পরিসংখ্যান বর্ষ গ্রন্থ,* ঢাকা।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, (১৯৯২), *পুষ্টিজনিত জরীপ,* ঢাকা।

ব্র্যাক, (১৯৯৩), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, (১৯৯৫), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

সমাজ সেবা অধিদপ্তর, (১৯৯২), *বার্ষিক প্রতিবেদন,* ঢাকা।

সিরডাপ, (১৯৯৩), *পরিবীক্ষণ, সমন্বয় এবং দারিদ্র ঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষিত,* ঢাকা।

হক এ, কে, ফজলুল, (১৯৮৮), *সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাংলাদেশের নারী।* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, জুন ১৯৮৭ ঢাকা।

হাশমী, সৈয়দ, (১৯৮৭), *পুঁজিবাদ ও বাংলাদেশে নারী শোষণ ঃ একটি ধারণাগত রূপরেখা,* ঢাকা ঃ সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র

Ahmed, Nasiruddin (ed.) (1995), *Training Module on Child and Women Development.* Published in BPATC with Collaboration of UNICEF. Dhaka : BPATC.

Bangladesh Bureau of Statistics, (1992), *Report of the Child Nutritional status survey.* Dhaka.

Begum, Nazmeer Noor, (1988), *Pay or Purdah.* Newzealand : Massey University Press Ltd.

Chowdhury, Rafiqul Huda, (1991), *Female Status in Bangladesh*. Dhaka : University Press Ltd.

Farooque, Abdullah, (1987), *Women in Bangladesh : A Disadvantaged Group*, Dhaka : Agami Prokashoni.

ILO, (1993), *Working Condition and Women in Bangladesh*. Dhaka.

Khan, Salma, (1987), *The Fifty Percent*. Dhaka : University Press Ltd.

Mannan, Abdul, (1988), *Sexual Division of Labour and son Preference in Rural Bangladesh*. India : Hindustan Publishing Corporation.

Ministry of Planning, GOB, (1993), *Reaching the People*. Dhaka

Ministry of Planning, GOB, (1992), *Achieving the Goals for Children and Development for the 1990s*. Dhaka : Bangladesh Press.

World Bank, (1990), *Annual Report*. Dhaka.